OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 568 - 574
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 568 - 574
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মনোজ মিত্রের নাটক ‘তক্ষক’ : মহাভারতের পরীক্ষিৎ কাহিনীর একটি বিনির্মাণ

প্রশান্ত কুম্ভকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ছাতনা চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়
Email ID : kumbhakarprasanta@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Porikshit, Mahabharata, Sringi, Curse, Takshak, Life, Fear of death, Joy, Sorrow.

Abstract
Manoj Mitra is well-known to everyone as a unique dramatist of recent times. He was also an accomplished actor, director and playwright. Manoj Mitra was associated with Bengali theater and film world for a long time. He has given us successful drama one after another. ‘Takshak’ is one of the successful and popular drama among them. It is a one act play based on the Parikshit story of Mahabharata. Though the story of the drama is taken from Mahabharata, the dramatist has skillfully adapted and presented it to suit the modern era. The conflict between life and death of a modern man is portrayed in this drama, and the way it is portrayed is simply amazing. At the end of the drama, death surrendered to life and victory song of life is announced. In real life, we lose the taste of life and it becomes boring for some sad event. But in this play the playwright has shown us through the character of Parikshit, that the life of seven days is as expansive as crossing seven seas. So, ignoring the fear of death and moving in natural rhythm is the name of life. We have to live every moment by fighting death, beating death, defeating death. This is the message conveyed in the play, which is not present in Parikshit story of Mahabharata. It is very sad to say that Manoj Mitra is no more with us. So, discussing his one act play ‘Takshak’ is actually just a small attempt to pay tribute to him.

Discussion

মহাকবিরা সময়ে সময়ে এমন কিছু গ্রন্থ সৃষ্টি করে যান, যেগুলিকে মহাকালের পক্ষেও বিদায় জানানো সম্ভব হয় না। সেগুলি অবিনশ্বর ও অবিনাশীরূপে কালে কালে সামাজিক মানুষের পথ চলার পাথেয় হয়ে ওঠে। সৃষ্টিশীল মানুষকেও সেগুলি রীতিমতো ভাবায়। সেই ভাবনা থেকেই একটি তত্ত্ব, দর্শন উঠে আসে এবং তার লিখিত রূপায়নে জন্ম নেয় আরেকটি নূতনতর নির্মাণের। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত তেমনই উচ্চস্তরের মহাগ্রন্থ যেগুলি কালস্রোতে আজও অমলিন। এইসব গ্রন্থের কাহিনী, চরিত্র, রচনারীতি, জীবনদর্শন, চিরন্তন সত্যতা আধুনিক সাহিত্যিকদের লেখনি ধারণে বাধ্য করায়। তবে আধুনিক যুগ হল বিজ্ঞানচেতনা, যুক্তিবিচার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গির যুগ। তাই এই যুগে বসে রামায়ণ,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 568 - 574
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মহাভারত বা পুরাণ উপনিষদের ভক্তিভাব তথা ধর্মীয় সত্ত্বাকে সেইভাবে ধরে রাখা সম্ভব নয়। কারণ সাহিত্যিকদের শিক্ষা, রুচি, সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা, জীবনকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে পর্যালোচনা করার প্রবণতা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের রচিত সাহিত্যে এসে পড়ে। ফলে দেব-দেবী, মুনিঋষির কাহিনীর অন্তরালে বর্তমান যুগসমস্যা এবং তার সমাধানের উপায় প্রকট হয়ে ওঠে।

নাট্যকার মনোজ মিত্রের এমনই কয়েকটি নাটক হল অশ্বত্থামা (১৯৬৩), তক্ষক (১৯৬৭), যা নেই ভারতে (২০০৭) প্রভৃতি। এইসব নাটকে তিনি পুরাণকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন মাত্র। কারণ নাটকগুলির ভাব বা সত্ত্বা পুরোপুরি বাস্তব। আমাদের আলোচ্য নাটকটি হল তক্ষক। এটি মহাভারতের পরীক্ষিৎ কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি একাঙ্ক নাটক। কিন্তু নাট্যকার মহাভারতের কাহিনীকে সুকৌশলে পরিবর্তিত করে তাকে আধুনিক মানুষের জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে পরিণত করেছেন এবং শেষপর্যন্ত মৃত্যু হার মেনেছে জীবনোচ্ছ্বাসের কাছে। নাটকটি বিশ্লেষণের আগে আমরা একবার মহাভারতের পরীক্ষিৎ কাহিনীটি সংক্ষেপে দেখে নিতে পারি।

মহাভারতে আদিপর্বের অন্তর্গত ৪০, ৪১, ৪২ ও ৪৩তম অধ্যায়ে পরীক্ষিতের কাহিনীটি বিবৃত হয়েছে।[১] অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুর পর পরীক্ষিৎ পৃথিবীর রাজা হন। তিনি প্রপিতামহ পাণ্ডুর মতোই অদ্বিতীয় ধনুর্ধর, যুদ্ধবিশারদ এবং মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। একদিন একটি হরিণকে শরবিদ্ধ করে তার পিছু নিতে নিতে তিনি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। অত্যধিক পরিশ্রম ও পিপাসায় অধির হয়ে একটি গোচারণ ভূমিতে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক তপস্বীকে দেখলেন যিনি স্তন্যপায়ী গোবৎসের মুখনিসৃত ফেনা পান করে জীবনধারণ করছেন।[২] রাজা পরীক্ষিৎ সেই মুনির কাছে শরবিদ্ধ হরিণ সম্পর্কে বারংবার জানতে চাইলেন। কিন্তু মুনি মৌনব্রতাবলম্বী থাকায় কোন উত্তর দিলেন না। তখন রাজা রাগে অন্ধ হয়ে ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে একটি মৃত সাপকে মুনির গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

ঐ মুনির নাম শমীক। রাজা তা জানতেন না। শমীক মুনির শৃঙ্গী নামে এক তরুণ পুত্র ছিল। তিনি খুব রাগী ছিলেন। ব্রহ্মার উপাসনা করে তিনি আশ্রমে ফিরছিলেন। তাঁর এক বন্ধু কৃশ শমীকমুনির এই অপমানের কথা তাঁকে গিয়ে পথিমধ্যে জানালেন। শৃঙ্গী রাগে জ্বলতে লাগলেন এবং রাজাকে অভিশাপ দিলেন, সপ্তরাত্রির মধ্যে বিষধর তক্ষক সেই পাপাত্মাকে যমালয়ে প্রেরণ করবে। আশ্রমে ফিরে এসে তিনি পিতাকে সমস্ত কথা জানালেন। শমীকমুনি পুত্রের এই অভিশাপের কথা শুনে দুঃখিত হলেন এবং পুত্রকে ভৎসনা করলেন। রাজা হয়তো জানতেন না যে শমীকমুনি মৌনব্রতাবলম্বী। তাই না হয় একটা কুকর্ম করে ফেলেছেন। কিন্তু তাই বলে না বুঝে রাজাকে অভিসম্পাত করা শৃঙ্গীর একেবারে উচিত হয়নি। শৃঙ্গীর পক্ষেও আর অভিশাপ ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ তিনি সত্যবাদী এবং বাকসিদ্ধ। তখন মহর্ষি শমীক গৌরমুখ নামে এক শিষ্যকে দিয়ে এই দুঃসম্বাদ পরীক্ষিতের কাছে পাঠালেন। সব শুনে এবং নিজের দুষ্কর্ম স্মরণ করে রাজা বিষন্ন ও অনুতপ্ত হলেন। এরপর মন্ত্রীদের নিয়ে পরামর্শ করে রাজা একটিমাত্র স্তম্ভের উপর সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করলেন এবং সেখানে নানাবিধ ঔষধ, বহু চিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করলেন। বিষবিদ্যা বিশারদ দ্বিজোত্তম কাশ্যপ এই সংবাদ শুনে ধনসম্পদের আশায় রাজাকে বাঁচাতে এলে তক্ষক তাঁকে বাধা দিলেন এবং তাঁকে অভিলষিত অর্থের অধিক প্রদানে সম্মত হলেন। কাশ্যপ ধ্যানে জানতে পারলেন যে, রাজার আয়ু শেষ হয়েছে। তাই তিনি তক্ষকের কাছে কাঙ্ক্ষিত ধনসম্পদ নিয়ে প্রস্থান করলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছে শুনে তক্ষক সমস্ত নাগেদের ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করে পুষ্প, কুশ, জল, ফল প্রভৃতি দ্রব্য নিয়ে আশীর্বাদ ছলে রাজার কাছে যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং নিজে কীটরূপে একটি সুস্বাদু ফলের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেন। দৈবক্রমে রাজা ঐ ফলটি খেতে গেলেন। তখন কীটরূপী তক্ষক নিজদেহ ধারণ করে রাজাকে দংশন করলেন। পরীক্ষিতের মৃত্যু হল। এই হল মহাভারতে পরীক্ষিৎ রাজার কাহিনী। এরপর আমরা মনোজ মিত্রের ‘তক্ষক’ নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

নাটকের একেবারে প্রথমেই দেখা যায়, পরীক্ষিৎ একটি বাণবিদ্ধ হরিণের পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছেন। পরীক্ষিতের একান্ত ইচ্ছা ছিল হরিণশিশুটিকে জীবন্ত ধরার।[৩] কিন্তু মূল মহাভারতে জীবন্ত মৃগশিশু ধরার মানসিকতা পরীক্ষিতের ছিল না। কারণ মহাভারতে উল্লেখ আছে যে পরীক্ষিতের বাণে বিদ্ধ হলে কোন হরিণেই জীবিতাবস্থায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 568 - 574
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পালাতে পারে না, কিন্তু এই হরিণটি যে বাণবিদ্ধ হয়েও পালাতে সক্ষম হয়েছে, তা কেবল তার অচিরাৎ স্বর্গলাভের কারণে -

"ন হি তেন মৃগো বিদ্ধো জীবংচ্ছতি বৈ বনে।
পূর্বরূপং তু তত্বূর্ণং তস্যাসীৎ স্বর্গতিং প্রতি।।"[৪]

যাইহোক, 'তক্ষক' নাটকে পরীক্ষিতের সঙ্গী ছিল তন্ত্রিপাল। সে একাধারে রাজার সারথী এবং বন্ধু। মহাভারতে এরূপ কোন তন্ত্রিপাল নেই। তন্ত্রিপাল নাট্যকারের মৌলিক কল্পনা প্রসূত। হরিণশিশুটিকে অনুসরণ করতে করতে পরীক্ষিৎ গভীর অরণ্যের এমন এক স্থানে পৌছেছেন যা তাঁকে অভিভূত করেছে- 'শান্ত নিস্তব্ধ সমাধিস্থ'। এরপরেই সারথি তন্ত্রিপালের আবির্ভাব হয়েছে। অন্ধকার গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে তন্ত্রিপাল রীতিমতো শঙ্কিত –

"কিছুই ঠাহর করতে পারছি না! মহারাজ, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি!"[৫]

তার মনে হয়েছে কোন অজানা বিপদ হয়তো তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাই পরীক্ষিতকে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষিৎ হরিণটির সন্ধান করতে চেয়েছেন। পথ হারানোর আনন্দে তিনি আরো দূরে হারিয়ে যেতে চেয়েছেন। এদিকে তন্ত্রিপাল ভয়ানক পিপাসার্ত। চোখমুখ তার পিপাসায় নীলবর্ণ হয়ে উঠেছে। পরীক্ষিৎ তার জন্য জল আনতে চাইলে তন্ত্রিপাল তা মেনে নিতে পারেনি। কারণ সে একজন সামান্য প্রজা মাত্র। তার জন্য মহারাজ স্বয়ং জল এনে দেবেন-এটা হতে পারে না। এর প্রত্যুত্তরে রাজা পরীক্ষিৎ যে কথা বলেন তা দর্শক ও পাঠককে অভিভূত করে –

"প্রজার সেবা যদি নাই করতে পারে, তবে সে কিসের রাজা – কার রাজা... কেনই বা রাজা!"[৬]

যাইহোক, তন্ত্রিপালকে জেগে থাকার পরামর্শ দিয়ে ঘুমন্ত বৃক্ষপুরীতে প্রবেশ করে তিনি জল নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু মহাভারতে এরকম কোন ঘটনা নেই। সেখানে আছে -

"পরিশ্রান্তঃ পিপাসার্ত আসসাদ মুনিং বনে।
...ময়া বিদ্ধো মৃগো নষ্টঃ কচ্চিত্তং দৃষ্ট বানসি।।"[৭]

অর্থাৎ, মৃগের অনুসরণ করতে করতে পরীক্ষিৎ পরিশ্রান্ত ও পিপাসায় কাতর হয়ে এক মৌনব্রতাবলম্বী মুনির কাছে গিয়ে বাণবিদ্ধ হরিণশিশু সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে পরীক্ষিৎ জলের সন্ধানে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে তপস্যারত এক মুনির কাছে গিয়ে পৌঁছালেন। তপস্যারত কঙ্কালসার মুনিকে দেখে তিনি বিস্মিত হন –

"...জীবিত না মৃত! (সতর্ক হয়ে ঋষির শ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য করে) হ্যাঁ আছেন, বেঁচে আছেন। উঃ এত ধীরে... এত একা... এত সূক্ষ্মভাবে কেউ বাঁচে... বাঁচতে পারে!"[৮]

ধ্যানরত মুনির সামনে নতজানু হয়ে বসে পরীক্ষিৎ নিজের বিপন্ন অবস্থা জানালেন এবং তৃষ্ণার জলের সন্ধান চাইলেন। কিন্তু মুনি মৌনব্রতাবলম্বী থাকায় কোন উত্তরই দিলেন না। পরীক্ষিতের গলার আওয়াজ ক্রমশ বর্ধিত হল। পাশের কোন এক স্থান থেকে শৃঙ্গী রাজাকে ভৎসনা করলেন এবং রাজা জল চাইলে তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু পরীক্ষিতের এক্ষুনি জল চাই। কারণ সারথি তন্ত্রিপাল পিপাসায় মূর্ছিতপ্রায়। তার জন্য জল তাঁকে সংগ্রহ করতেই হবে। তাই ধ্যানস্থ মুনির কাছে তিনি আবারও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের সন্ধান চাইলেন। কোন প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ এবং উন্মত্ত হয়ে একটি মরা, পচা সাপকে ধ্যানরত মুনির গলায় দেবার জন্য উদ্যত হলেন। এমন সময় শৃঙ্গী এসে তাঁর পিতা ও নিজের পরিচয় দিয়ে রাজাকে যথেষ্ট ভৎসনা করলেন। রাজাও শৃঙ্গীর সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়লেন এবং ধনুকের ডগা দিয়ে মৃত সাপটিকে ঋষির গলায় জড়িয়ে দিলেন। সাথে সাথে শৃঙ্গীর অভিশাপ নেমে এল –

"ধ্বংস হবি...ধ্বংস হবি তুই! অনাচারী রাজা...মরবি...মরবি তুই...আজ থেকে সাত দিনের দিন তক্ষকের কামড়ে মরবি...।"[৯]

ধ্যানমগ্ন ঋষির শরীর কেঁপে উঠল। চোখ উন্মুক্ত হল। পুত্রের এই অভিশাপে তিনি দুঃখিত হলেন। ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত মানুষটির মৃত্যু কামনা করে শৃঙ্গী ভালো করেনি। কারণ ঋষির কাজ শুধু পুণ্য অর্জন নয়, পুণ্যকে রক্ষা করতে হয়। এরপর শৃঙ্গীর তাঁর নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় জর্জরিত হলেন। চিৎকার করে পরীক্ষিতকে ডাকলেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 568 - 574
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"থামাও ...ঘোড়া থামাও...ফিরে এসো রাজা...তৃষ্ণা মিটিয়ে যাও...।"[১০]

ব্রহ্মশাপ তো ফিরিয়ে নেওয়ার নয়। কিন্তু রাজা যেন তৃষ্ণায় না মারা যান- শৃঙ্গী এই আবেদন রাখেন পিতার কাছে। রাজার পথে যেন একটি মায়া সরোবর সৃষ্টি হয় এবং রাজা জল পান করে যেন তৃপ্ত হন। মহর্ষি শমীক তাই করলেন।

এখন লক্ষ্য করার বিষয় এটা যে, নাট্যকার মনোজ মিত্র মহাভারতের কাহিনীকে অনুসরণ করেন নি, উপরন্তু পরীক্ষিৎ-শৃঙ্গী ও শৃঙ্গী-শমীকের যে কথোপকথন উপস্থাপন করেছেন তাতে নাটকটি আরো জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে পরীক্ষিৎ ও শৃঙ্গীর কথোপকথন নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি। মহাভারতে এই কথোপকথন নেই। মহাভারতে শমীকমুনির এই দুর্দশার বর্ণনাটি শৃঙ্গীর এক বন্ধু কুশ শৃঙ্গীকে জানিয়েছে এবং শৃঙ্গী এই কথা শুনেই পরীক্ষিতকে ব্রহ্মশাপ দিয়েছেন। মহাভারতে আছে -

"রাজ্ঞা পরিক্ষিতা তাত মৃগয়াং পরিধাবতা।
অবসক্তঃ পিতুস্তেহদ্য মৃতঃ স্কন্ধে ভুজঙ্গমঃ।।"[১১]

অর্থাৎ, মৃগয়াবিহারী পরীক্ষিৎ এই তপোবনে মৃগয়া করতে এসেছিলেন, তিনি তোমার পিতার স্কন্ধে মরা সাপ সমর্পণ করে গিয়েছেন। আরেকটি বিষয় হল এই যে মহাভারতে পরীক্ষিৎ শমীকমুনির কাছে জলের সন্ধান চাননি, মৃগের সন্ধান চেয়েছিলেন। মুনির কোন উত্তর না পেয়ে রাজা রেগে যান এবং একটি মরাপচা সাপকে মুনির গলার ঝুলিয়ে দেন। কুশের কাছে এই তথ্য পেয়ে শৃঙ্গী রাজাকে অভিশাপ দেন -

"যোহসৌ বৃদ্ধস্য তাতস্য তথা কৃচ্ছগতস্য হ। স্কন্ধে মৃতং সমাস্রীক্ষীৎপন্নগং রাজকিল্বিষী।।
তং পাপমতি সংক্রুদ্ধস্তক্ষকঃ পন্নগেশ্বর। আশীবিষস্তিগ্ম তেজা মদ্বাক্য বলচোদিতঃ।।
সপ্তরাত্রাদিতো নেতা যমস্য সদনং পতি। দ্বিজানামবমন্তারং কুরূণাময়শস্করম।।"[১২]

অর্থাৎ, যে নৃপাধম আমার মৌনব্রতাবলম্বী বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃত দিয়েছে, আমার বাক্যানুসারে তীক্ষ্ম বিষধর পন্নগেশ্বর তক্ষক সপ্তরাত্রির মধ্যে ব্রাহ্মণের অপমানকারী সেই পাপাত্মাকে যমসদনে প্রেরণ করবে।[১৩] কিন্তু 'তক্ষক' নাটকে নাট্যকার কি অপূর্ব কৌশলে পরীক্ষিৎ ও শৃঙ্গীর কথোপকথনটি সৃজন করেছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়ার লোভ সংবরণ করা গেল না -

"শৃঙ্গী ।। ব্যঙ্গ...ব্যঙ্গ করো রাজা...এত দম্ভ! এতই স্পর্ধা! ধরাকে সরা জ্ঞান করো! দেখবে...দেখবে তুমি রাজা, দেখবে সাধকের শক্তি!
পরীক্ষিৎ ।। দেখাও...দেখাও তাপস বালক, শুধু মুখে আস্ফালন না করে সাধ্য থাকে বাধা দাও! দেখি তোমার তপস্যার ক্ষমতা!...
শৃঙ্গী ।। মরবি...মরবি তুই...আজ থেকে সাত দিনের দিন তক্ষকের কামড়ে মরবি...
পরীক্ষিৎ ।। (হা হা করে হেসে উঠে) ধন্য হলাম...প্রীত হলাম...কৃতার্ত হলাম বালক...
শৃঙ্গী ।। তক্ষক! বিষধর তক্ষক! কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না...
পরীক্ষিৎ ।। (সক্রোধে) তোর তক্ষক আমার পা অবধি পৌঁছতে পারবে?
শৃঙ্গী ।। ব্রহ্মতালুতে দংশন করবে...
পরীক্ষিৎ ।। ওরে, সে কি একটা তক্ষকের কর্ম!
শৃঙ্গী ।। একটা তক্ষক...সহস্র মুখ...সহস্র ফনা ধরে সহস্রবার তোকে দংশন করবে...সহস্রবার...
পরীক্ষিৎ ।। তা সহস্রমুখ হলেও লেজ তো তার একটাই থাকবে! তাতেই হবে...কি করে তোর তক্ষককে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড
দেখাতে হয়...সে আমার জানা আছে..."[১৪]

শুধু তাই নয়, এরপর আমরা দেখব যে, শৃঙ্গীর শাপপ্রভাবে পিপাসায় কাতর হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষিৎ কিভাবে একফোঁটা জলও মুখে দিতে পারছেন না। এই ঘটনা মহাভারতে নেই। এগুলি নাট্যকারের অপূর্ব সঙ্গতি ও দক্ষতার ফল। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে বৃদ্ধ মন্ত্রী প্রবেশ করেছেন। তিনি জঙ্গলময় পরীক্ষিতকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের দেখাও হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 568 - 574
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হরিণ সম্পর্কে মন্ত্রীর কৌতূহল থাকলেও পরীক্ষিতের পক্ষে এখন সবকিছু বলা সম্ভব নয়। কারণ তিনি ভয়ানক পিপাসার্ত। এখন শিবিরে ফেরা প্রয়োজন। কিন্তু মন্ত্রী জানিয়েছেন যে তিনিও পথ হারিয়ে ফেলেছেন। ঠিকআছে তাহলে আগে জলের সন্ধান করা হোক। কারণ পথ রাজা তৈরী করে নিতে পারবেন, কিন্তু সর্বাগ্রে তৃষ্ণা মেটাতে হবে। চিন্তিত মন্ত্রী মাথা তুলতেই অদূরে একটি পূর্ণ সরোবর দেখতে পান। আমরা জানি ঐ সরোবরটি মহর্ষি শমীক তপঃপ্রভাবে সৃষ্টি করেছেন। যাইহোক, পূর্ণ সরোবর দেখে পরীক্ষিৎ ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন –

> "এতো সরোবর নয় মন্ত্রীমশাই, সবুজ লতাপাতার ঘোমটায় যেন এক শান্ত কোমল কিশোরী আমারই জন্য অপেক্ষা করছে...বহু যুগ যুগান্ত ধরে...তার শ্যামল সঘন আঁখিপল্লব আমারই মুখের পানে আকুল হয়ে চেয়ে আছে।"[১৫]

কিন্তু যেমনি তিনি ঐ সরোবরে জল পান করতে গেছেন তখনি কোমল মসৃণ তৃণদলকে সর্পভ্রমে আর্তনাদ করে উঠেছেন। মন্ত্রী বারংবার তাঁকে বোঝালেও শৃঙ্গীর শাপপ্রভাবে তৃণদলকে তিনি তক্ষক রূপেই দেখতে পাচ্ছেন। বাতাসে দীর্ঘ ঘাসের ডগাগুলির জলে নুয়ে পড়াকে তাঁর তক্ষকের বিষাক্ত ছোবল বলেই মনে হয়েছে। তিনি ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেছেন।

চতুর্থ দৃশ্যে আবার ঋষি অর্থাৎ শমীক ও শৃঙ্গীর কথোপকথন শুরু হয়েছে। রাজার জল খাওয়া হল না দেখে শৃঙ্গী অনুশোচনায় কাতর হয়ে উঠেছেন। শমীক তাঁর পুত্রকে ব্রহ্মশাপ ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। কিন্তু শৃঙ্গী জানিয়েছেন তা সম্ভব নয়। তার থেকে কিছু একটা ব্যবস্থা করা হোক। অন্ততঃ সর্পাঘাতে মৃত্যুর আগে পরীক্ষিৎ জল পান করুক। তাই শৃঙ্গী এবার পিতার কাছে একটা মায়াঝর্ণা সৃজনের আবেদন জানালেন এবং ঐ ঝর্ণা যেন রাজার পায়ের সামনে দিয়ে বয়ে যায়। মহর্ষির ইচ্ছায় তাই হল। পঞ্চম দৃশ্যে পায়ের সামনে ঝর্ণা দেখে রাজা প্রাণ গিরে পেলেন –

> "ওরে মূর্খ পাপিষ্ঠ দুরাচার! কোথায় ছিলি! জানিস না আমি তৃষ্ণার্ত! দাঁড়া! তোকে আমি শোষণ করব...নিঃশেষ করব...ধরিত্রীর বুক থেকে মুছে দেব তোর ধারাটি!"[১৬]

কিন্তু জল পান করতে গিয়ে ঝর্নাকে তাঁর মনে হয়েছে বাসুকি নাগ। যেন ছত্র মেলে ধেয়ে আসছে তাঁর দিকে। মন্ত্রী জোর করে তরবারি দিয়ে হত্যার ভয় দেখিয়ে জলপান করাতে চাইলে তিনি মন্ত্রীকে ভুল বুঝেছেন। ব্রহ্মশাপে তিনি বিকারগ্রস্ত। পরীক্ষিতের মনে হয়েছে যে, মন্ত্রী রাজ্যের লোভে তাঁর সাথে চক্রান্ত করেছেন। তাই পরীক্ষিৎ এবারও জল পান করলেন না। উন্মাদের মতো ছুটে পালিয়ে গেলেন।

এরপর তন্ত্রিপালের সাথে রাজার দেখা হয়েছে। এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তন্ত্রিপালকে একটি দিব্য রসালো ফল দিয়েছেন। কিন্তু পরীক্ষিতকে না খাইয়ে সে কিভাবে খাবে? পরীক্ষিৎ আনন্দে ফলটিকে দুভাগ করলেন দুজনে খাবেন বলে। কিন্তু ফলের টুকরোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দৃষ্টি পাল্টে যায়। এটা বিষফল নয় তো! এখানেও তিনি ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছেন –

> "প্রজারা সব জানে...শুধু রাজারা প্রজাদের মনের কথা জানতে পারে না। এই যে আমার মুকুট...সহস্র মণিমুক্তা খচিত-এর প্রত্যেকটির ওপর সহস্র লোভী চক্ষু বিঁধে আছে। রাজার শিরে সহস্র ফণা সে তো শুধু নাগনাগিনী তোলে না...তোলে সহস্র লোভী প্রজা..."।[১৭]

বিধাতা প্রদত্ত ফলটি মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে নষ্ট করে দেন। তারপর তাঁর চেতনা ফেরে। তাঁর মনে হয়েছে, হয়তো ফলটি বিষাক্ত ছিল না, হয়তো তন্ত্রিপাল ও মন্ত্রী তাঁকে মারতে চান নি, হয়তো ঝর্নার ধারা ও সরোবরের সাপ সবই ভুল ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। মন্ত্রীকে জানালেন যে, শৃঙ্গীর দ্বারা তিনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত। আজ থেকে সাত দিনে তক্ষকের দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে। তাই সর্বক্ষণ এবং সর্বত্র তিনি তক্ষকের বিষাক্ত নিঃশ্বাস অনুভব করছেন। এরপর তন্ত্রিপাল রাজাকে এক ভিন্ন দর্শনের সন্ধান দিয়েছেন। শুধু কি পরীক্ষিতকে? তন্ত্রিপালের এই দর্শন হাজার হাজার মৃত্যুগামী মানুষের বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে। একটু তুলে ধরা হল -

"তন্ত্রিপাল ।। ভয়! মৃত্যুভয়ে উন্মাদ হয়েছেন আপনি! (ক্রমশ মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়ছে) ব্রহ্মশাপ সত্য হ'লে মৃত্যু সে তো আসবে সপ্তম দিনে! তার ভয়ে আজই কেন মরবেন মহারাজ?

পরীক্ষিৎ ।। তন্ত্রিপাল!

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 568 - 574
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তন্ত্রিপাল ।। (গোঙাতে গোঙাতে) মৃত্যু...সে তো জীবনের পরিণতি! (থেমে) সেই তো মূর্খ, যে সেই পরিণতিকে মানে না – আবার সেই তো কাপুরুষ যে তার ভয়ে ভীত হয়! (থেমে) মহারাজ আপনি বীর, আপনি জ্ঞানী...ভেবে দেখুন, সপ্তম দিন কতো দূরে...

পরীক্ষিৎ ।। সপ্তম দিন...কতো দূরে...

তন্ত্রিপাল ।। অনেক দূরে! জীবনের একটা দিন একটা সমুদ্র! মৃত্যু তবে আজ হতে সপ্ত সমুদ্র দূরে! আজই কেন মরবেন...কেন হার মানবেন! এখনো তো সাতটা দিন। ....বাঁচুন...বাঁচুন... মহারাজ সাত দিনের প্রতি মুহূর্তে বাঁচুন... (তন্ত্রিপালের জ্ঞান লুপ্ত হয়)

পরীক্ষিৎ ।। তন্ত্রিপাল! তন্ত্রিপাল... (তন্ত্রিপালের মুখ নত হয়) ...

তন্ত্রিপাল ।। মরার আগে মরবেন না মহারাজ... সাতদিন অনেক সময়...অনেক...”।[১৮]

সত্যি কথা বলতে কি – নাট্যকারের এই অনুভূতি, প্রজ্ঞা ও দর্শনের কাছে আমদের মাথা নত হয়ে যায়। মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা জোগায়। এই দর্শন কিন্তু মহাভারতের পরীক্ষিৎ কাহিনীতে নেই। তাই তো ‘তক্ষক’ নাট্যকার মনোজ মিত্রের একটি নতুন সৃষ্টি। মহাভারতে পরীক্ষিতকে সুরক্ষিত রাখার জন্য একটি মাত্র স্তম্ভের উপর প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছে। নানাবিধ ঔষধ, চিকিৎসক, ব্রাহ্মণ সেখানে নিয়োগ করা হয়েছে। ৪২ তম অধ্যায়ের ২৯ ও ৩০ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে -

“সংমন্ত্র্য মন্ত্রীভিশ্চৈব স তথা মন্ত্রততৎববিৎ।
প্রাসাদং কারয়ামাস একস্তম্ভং সুরক্ষিতম্।।
রক্ষাং চ বিদধে তএ ভিষজশ্চৌষধানি চ।
ব্রাহ্মণান্মন্ত্রসিদ্ধাংশ্চ সর্বোত বৈ ন্যযোজয়ৎ।।”[১৯]

এমনকি মহর্ষি কাশ্যপ পরীক্ষিতকে রক্ষা করার জন্য এলে পথিমধ্যে তক্ষক তাঁকে আগলে ধরেন এবং বোঝান যে, পরীক্ষিতের আয়ু শেষ হয়েছে, তাঁকে বাঁচানো সম্ভব নয়। ফলে সাত দিনের দিনে তক্ষকের দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়েছে। নাটকে পরীক্ষিতের মৃত্যু নেই। শেষ দৃশ্যে দেখতে পাচ্ছি যে, মহর্ষি শমীক পরীক্ষিতকে বাঁচাতে চাইলেও শৃঙ্গীই বারবার মৃত্যু হয়ে তাঁর সামনে প্রতিভাত হয়েছেন। এখানে পিতাপুত্র যথাক্রমে জীবন ও মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। শৃঙ্গী নিজেই বলেছেন –

“আমি সেই তক্ষক! (হা হা করে হাসে) তুমি জীবন...তুমি স্থিতি! আমি তক্ষক...আমি মরণ! মহাপ্রলয়![২০]

কিন্তু শেষপর্যন্ত শৃঙ্গী অবিচল থাকতে পারেন নি। পরীক্ষিতের সামনে গিয়ে তাঁর দু’হাত ধরে বলেছেন - ‘ব্রহ্মশাপ আমি তুলে নেবো পরীক্ষিৎ’। সেই অভিশাপ বর্তাবে তাঁর নিজেরই উপর। রাজা বেঁচে থাকবেন, তিনি মরবেন। কিন্তু পরীক্ষিৎ মৃত্যুকে জয় করে নিয়েছেন। আজ আর মরতে তিনি ভয় পান না। শৃঙ্গীকে তাই বলেছেন –

“মৃত্যুকে ভয় করে বাঁচা যায় না...প্রতি মুহূর্তে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে, আঘাত করে তাকে পরাজিত করে তবেই না জীবনকে ভোগ করা যায়...এতো আজ তোমার কল্যাণেই শিখেছি শৃঙ্গী...”।[২১]

তাই সপ্তদিনের দিন যেন সহস্র ফণায়, ভয়ংকর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে মৃত্যু তাঁকে দেখা দেয়। বাকসিদ্ধ বালকের বাণী সত্য হোক এই তিনি চান। অবশেষে শৃঙ্গী পরীক্ষিতের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ঋষি বলেছেন, পরীক্ষিতের পায়ের কাছে মৃত্যু আজ ক্ষমা চাইছে, মৃত্যু হার মেনেছে তাঁর কাছে। তাই পরীক্ষিতের কাছে মৃত্যু ভয় বা লজ্জা কিছুই নয়। সপ্তম দিনে তিনি মরবেন। কিন্তু দিন সপ্তম সমুদ্র দূরে। তার আগে ছয় দিন তিনি বাঁচবেন এবং বিরাট হয়ে বাঁচবেন।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মনোজ মিত্র ‘তক্ষক’ নাটকের পটভূমিটি মহাভারত থেকে সংগ্রহ করলেও সর্বত্রই তাঁর মৌলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। নতুন চরিত্র নির্মাণে, সংলাপ সৃজনে, জীবনদর্শনে এ নাটক এক নতুন সৃষ্টি। মহাভারতের পরীক্ষিৎ-কাহিনীকে তিনি জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে পরিণত করেছেন এবং জীবনেরই জয়গান গেয়েছেন। এই নাটক আমাদের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 63
Website: https://tirj.org.in, Page No. 568 - 574
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাবায়, বিস্মিত করে এবং বেঁচে থাকার মনোবলকে দৃঢ় করে। মহাভারতের এই কাহিনী এক নতুন রূপে, নতুন ভাবে আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। তাইতো 'তক্ষক' নাটক পরীক্ষিৎ-কাহিনীর এক বিনির্মাণ হয়ে উঠেছে।

Reference:

১. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত, অক্ষয় লাইব্রেরী, ২০১৬, পৃ. ৫৩-৫৭
২. তদেব, পৃ. ৫৩
৩. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র, ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৬, পৃ. ৪১৯
৪. https//sanskritdocuments.org>mbhk
৫. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র, ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৬, পৃ. ৪২০
৬. তদেব, পৃ. ৪২০
৭. https//sanskritdocuments.org>mbhk
৮. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র, ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৬, পৃ. ৪২২
৯. তদেব, পৃ. ৪২৪
১০. তদেব, পৃ. ৪২৫
১১. https//sanskritdocuments.org>mbhk
১২. তদেব
১৩. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত মহাভারত, অক্ষয় লাইব্রেরী, ২০১৬, পৃ. ৫৪
১৪. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র, ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৬, পৃ. ৪২৪
১৫. তদেব, পৃ. ৪২৮
১৬. তদেব, পৃ. ৪৩১
১৭. তদেব, পৃ. ৪৩৩
১৮. তদেব, পৃ. ৪৩৫
১৯. https//sanskritdocuments.org>mbhk
২০. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র, ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৬, পৃ. ৪৩৬